The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

ভাষা-আন্দোলনে আনিসুজ্জামানের অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ

[Anisuzzaman's Participation and Observations in the Language Movement]

Md. Jakaria Hossen
PhD Fellow, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

Dr. Sumaiya Khanom
Professor, Department of Bangla, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 23 February 2025
Received in revised: 30 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Language Movement, Anisuzzaman, Participation, Observation

ABSTRACT

This paper explores the role of Anisuzzaman in the Bengali Language Movement, emphasizing his active participation and observations. It examines his contributions, including the publication of the first booklet on the movement, and his efforts in mobilizing public opinion. The study highlights his role in breaking Section 144 and providing strategic direction during crucial phases of the movement. Based on historical sources and personal accounts, the research offers insights into his influence on the socio-political dynamics of the era, illustrating his commitment to linguistic and national identity.

১. ভূমিকা

১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনের ঘটনাসমূহের সঙ্গে আনিসুজ্জামান (১৯৩৭–২০২০) সরাসরি যুক্ত ছিলেন। জানুয়ারির শেষে এই আন্দোলনের সূচনা থেকে শুরু করে একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক ঘটনার আগে ও পরে আন্দোলনে সক্রিয় থেকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে শামিল হন এবং ১৯৫৫ সালের আন্দোলনেও তিনি জড়িত ছিলেন। এছাড়া ভাষা-আন্দোলন পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। একইসাথে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবি ও বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় আনিসুজ্জামান সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। কারণ তিনি নিজেকে ভাষা-আন্দোলনের প্রজন্ম বলে দাবি করতেন।[১] ফলে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায়, সাংস্কৃতিক পট-পরিবর্তনে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বিস্তারে এবং সর্বোপরি, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাষা-আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। ভাষা-আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর এসব পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন রচনায় উঠে এসেছে। এই গবেষণা প্রবন্ধে আনিসুজ্জামানের ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, ভাষা-আন্দোলন পরবর্তী এই আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

২. আনিসুজ্জামানের ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ

ভাষা-আন্দোলনের সূচনা হয় দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে, তমুদ্দিন মজলিস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের নেতৃত্বে। আনিসুজ্জামান আন্দোলনের এই পর্বে অংশগ্রহণ করেননি। কারণ মুসলিম ছাত্রলীগের এক নেতা তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, এই ধর্মঘট পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য হুমকি। তাই তিনি স্থির করেছিলেন, 'পাকিস্তান রক্ষার জন্য আমি ধর্মঘটে যাব না'।[২] তবে ভাষা-আন্দোলনের প্রথম পর্বে আনিসুজ্জামান দূরে থাকলেও ধীরে-ধীরে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়ার পর যুবলীগের কর্মী হিসেবে তিনি বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, '১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে যোগ দেইনি। নিজের সে ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছিলাম ১৯৫২ সালে'।[৩] এসময়ে ভাষা-আন্দোলনের পুস্তিকা লেখা, আন্দোলনের কর্মসূচি ঠিক করার গোপন সভাগুলোতে অংশগ্রহণ, আন্দোলনের সময় বক্তৃতা লিখে দেওয়া, যুবলীগ অফিসের দায়িত্ব গ্রহণ প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া আন্দোলনের নানা ঘটনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর দেওয়া বর্ণনাসমূহ ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ।

ভাষা-আন্দোলনের শুরুতেই আনিসুজ্জামান *রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন/ কী ও কেন* শিরোনাম একটি পুস্তিকা লেখেন। এটিই ছিল ভাষা-আন্দোলনে লেখা প্রথম পুস্তিকা।[৪] আট পৃষ্ঠার এই প্রচারপত্র বের হয় যুবলীগ থেকে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ থেকে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রচার পুস্তিকার জন্য প্রথম এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল মোহাম্মদ তোয়াহাকে। তবে তিনি কাজটি করতে না পারায় অলি আহাদের নির্দেশে আনিসুজ্জামান এই কাজটি করেন। একটি সাক্ষাৎকারে ভাষা-আন্দোলনে তাঁর সবচেয়ে বড় অর্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় উত্তরে আনিসুজ্জামান এই পুস্তিকা লেখাকে তাঁর সবচেয়ে বড় অর্জন বলে মনে করেছেন।[৫]

আনিসুজ্জামান ভাষা-আন্দোলনের বায়ান্ন পর্বে আন্দোলনের সূচনাকাল জানুয়ারির শেষ থেকেই নানা কাজে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পুনরুক্তির প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ ছাত্র-ধর্মঘট, মিছিল ও সভা করে। গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ'।[৬] ৩০ জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের এই ঐতিহাসিক সভায় আনিসুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। সংগ্রাম পরিষদে ছিলেন আওয়ামীলীগ, খিলাফতে রব্বানী পার্টি, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম-পরিষদ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ। ৩০ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম-পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবসের পরে ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি সাফল্যের সঙ্গে পতাকা দিবস পালিত হয়।[৭] তবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন ২১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট, সভা, বিক্ষোভ-মিছিল ও জগন্নাথ হলের মিলনায়তনে সভা করার ঘোষণা দেন।[৮] এ সময়ে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো জগন্নাথ কলেজেও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে আনিসুজ্জামান কলেজের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হন।[৯] তিনি একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে চৌঠা ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ এবং এগারোই ফেব্রুয়ারিতে পতাকা দিবস পালন করেন। আন্দোলনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে পোগোজ স্কুল ও সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলে ধর্মঘট করানো, তহবিল সংগ্রহের জন্য ট্রেনে চাঁদা উঠানো প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়েই তিনি ভাষা-আন্দোলনের পক্ষে জনমত সংগ্রহ করতে গিয়ে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষের জনসমর্থনের ব্যাপকতা উপলব্ধি করেন।[১০]

২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ১৪৪ ধারা জারি হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের জরুরি সভা বসে। আনিসুজ্জামান এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে-বিপক্ষে মতামত আসে। ১১-৪ ভোটে সিদ্ধান্ত হয়, ২১ তারিখের কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হবে এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে সর্বদলীয় সংগ্রাম-পরিষদ বিলুপ্ত হবে।[১১] কর্মসূচি প্রত্যাহারের বিপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন।

> যাঁরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করার বিরুদ্ধে অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অলি আহাদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিনকে জানতাম। অন্যদের নাম পরে জেনেছিলাম: ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি শামসুল আলম এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি গোলাম মওলা।[১২]

আনিসুজ্জামানেরও এসময় মনে হয়েছিলো ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হোক। এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভাষা-আন্দোলনের সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নানা মতানৈক্য ছিল এবং আন্দোলন পরিচালনার কৌশল নিয়ে বিতর্ক চলছিল। এ প্রসঙ্গে ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক তাঁর গ্রন্থে বলেন,

> মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতির কারণে জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংগ্রাম পরিষদের সভায় সব রাজনৈতিক নেতা এবং অধিকাংশ ছাত্রনেতা ১৪৪ ধারা অমান্য করে সরকারের সঙ্গে সংঘাতে যেতে রাজি হননি। স্বয়ং সভাপতিও তাঁদের সমর্থন করে বক্তব্য দেন।[১৩]

যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কর্মসূচি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়, তবুও ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের চরম মুহূর্তে কিছু নেতা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন, যা পরবর্তী সময়ে ভাষা-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল ঘটায়।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে আনিসুজ্জামান তাঁর পরিবারের সম্মতিতেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এমনকি এদিন সকালবেলা তাঁকে আর তাঁর একদল বন্ধুকে খাইয়ে তাঁর মা আন্দোলনে পাঠিয়েছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, পুলিশ ধরলে কী করতে হবে।[১৪] জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনে গিয়ে তিনি পুলিশি আক্রমণের মুখে হতবিহ্বল আন্দোলনকারীদের একত্রিত করতে অনভিজ্ঞ হয়েও মাইকে সাহস করে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। এ সময়ে তিনি মোহাম্মদ তোয়াহার জন্যও বক্তৃতা লিখে দেন। এছাড়া হতাহত ছাত্রদের হাসপাতালে নিতে সহায়তা করেন।[১৫] পুলিশি গ্রেপ্তারের মুখে যুবলীগের নেতারা আত্মগোপনে চলে গেলে আনিসুজ্জামানের ওপর অলি আহাদ যুবলীগ অফিসের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাঁকে গ্রেফতার এড়ানোর নির্দেশ দেন। ফলে তিনি অন্যদের মত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দশ জনের মিছিলে যাননি।[১৬]

২১ ফেব্রুয়ারিতে আন্দোলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি এ দিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রমে আনিসুজ্জামান তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন। আন্দোলনের দিন ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ছোটো-ছোটো দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের দিকে লোক জমায়েত শুরু হয়। আগের দিন সর্বদলীয়-সংগ্রাম-পরিষদের সভায় ১৪৪ ধারা না ভাঙার যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধে শ্রোতারা প্রতিবাদ করে। ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে বক্তৃতায় জনগণ সমর্থন দেয়। সিদ্ধান্ত হয় ১৪৪ ধারা ভাঙার।[১৭] ১৪৪ ধারা ভাঙায় ২০ ফেব্রুয়ারির সভার পূর্বশর্তানুযায়ী সর্বদলীয়-রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। যারা ১৪৪ ধারা ভাঙবে তাদের লম্বা লাইনে দাঁড় করিয়ে নামের তালিকা করা হয়। এ সময়ে নিশ্চিত গ্রেপ্তার জেনেও দশ জন করে মিছিল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে।[১৮] মিছিল বেরোনোর পর পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে। এতে

উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। পুলিশ ও ছাত্ররা মুখোমুখি অবস্থান নেয়। এ সময়ে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে পরিষদ ভবনে গিয়ে এম.এল.এ-দের প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসে আন্দোলনকারীরা ফিরে আসে। ধীরে-ধীরে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে চলে যায়। বেলা তিনটার দিকে পুলিশ গুলি চালালে মৃত্যুর সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এদিন তিনজন শহীদ হন।[১৯] আনিসুজ্জামান এই ঘটনার বর্ণনায় বলছেন –

> বেলা তিনটের একটু পরে গুলি চললো। আহতদের ধরাধরি করে জরুরি বিভাগে নেওয়া হলো। প্রথমে সবাই হতচকিত, তারপর বিক্ষোভ উঠলো চরমে। একটু পরপরই একেকজনের মৃত্যুর সংবাদ – কখনোবা নিছক গুজব – ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। প্রথমে তিনজন শহীদের নাম আমরা শুনি – আবুল বরকত, সালাহউদ্দীন ও সালাম। পরে বোঝা যায়, রফিকউদ্দীনকেই ভুল করা হয়েছিলো সালাহউদ্দীন বলে – তার মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল।[২০]

এই ঘটনায় ভাষা-আন্দোলন আরো বেগবান হয়। এটি প্রমাণ করে যে, সাধারণ ছাত্র ও জনগণের ইচ্ছাই আন্দোলনের গতি নির্ধারণ করেছিলো। আনিসুজ্জামানের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, পুলিশি দমননীতি ভাষা-আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, বরং শহিদদের আত্মত্যাগ আন্দোলনকে আরও বেগবান করেছে। আন্দোলনকারীদের সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে।

২১ ফেব্রুয়ারির নৃশংসতার পরও ২২ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন যেভাবে স্তিমিত না হয়ে আরো গতি পায় সে প্রসঙ্গগুলো আনিসুজ্জামান বর্ণনা করেছেন। ২২ ফেব্রুয়ারির মিছিলে পুলিশের একাধিক স্থানে গুলি, ক্রুদ্ধ জনতার সরকার সমর্থিত পত্রিকা 'সংবাদ' ও 'মর্নিং নিউজ' আন্দোলন-বিরোধী সংবাদ প্রচার করায় তাদের অফিসে হামলা চালানো ও পুড়িয়ে দেওয়া এবং সকালে মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে ভাষা শহীদদের জন্য গায়েবানা জানাজা প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলো তিনি তুলে ধরেন।[২১] পরে অলি আহাদের নেতৃত্বে সভা ও মিছিল হয়। ২২ ফেব্রুয়ারিতে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করা হলেও পাকিস্তান গণপরিষদ তা স্থগিত রাখে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ ভেঙে গেলে এ পর্যায়ে ভাষা-আন্দোলনের নেতৃত্বে অলি আহাদ চলে আসেন এবং এ সময়ে যুবলীগের বিভিন্ন স্থানীয় নেতারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বলে আনিসুজ্জামান উল্লেখ করেন।[২২] তাঁদের মধ্যে দিনাজপুরে দবিরুল ইসলাম ও নুরুল হুদা কাদের বখ্শ, রাজশাহীতে আতাউর রহমান, কুষ্টিয়ায় আসহাবুল হক, নোয়াখালীতে খাজা আহমদ, সিলেটে নুরুর রহমান, নারায়ণগঞ্জে শামসুজ্জোহা ও শফি হোসেন খান উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনা স্পষ্ট করে যে, ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরেও আন্দোলন থেমে যায়নি, বরং আরও বিস্তৃত হয়ে নতুন নেতৃত্বের হাতে চলে যায়।

২৩ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ হরতালের ডাক দেওয়া হয় ও মানুষ সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ধর্মঘটকে সফল করে। আনিসুজ্জামান জগন্নাথ কলেজের হয়ে এদিন ধর্মঘটের পক্ষে প্রচারকাজ চালান। তাঁর বাবাও আন্দোলনের কাজে গাড়ি ব্যবহার করতে দেন।[২৩] শহীদদের স্মৃতি রক্ষায় যে জায়গায় গুলি চলেছিল ২৩ তারিখ মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা মিলে সেখানে রাতারাতি শহীদ মিনার গড়ে তোলে।[২৪] শহিদ মিনার উদ্বোধন কালে শহিদ শফিউরের পিতা উপস্থিত ছিলেন। শহিদ মিনার দেখতে সাধারণ মানুষের ঢল নামে এবং যার যা সামর্থ্য অনুযায়ী টাকা পয়সাও দান করেন। আনিসুজ্জামানের মা এসময় তাঁর মৃত মেয়ের সোনার অলংকার শহিদ মিনারে দান করেন।[২৫] ২৩ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জেও শহিদদের হত্যার প্রতিবাদে সভা-সমাবেশ-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে খান সাহেব ওসমান আলী তাঁর পুত্ররা ছাড়াও অনেক নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হন। মূলত এদিন থেকেই সারাদেশে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তারের পালা শুরু হয়; রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আবুল হাশিম, আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, মনোরঞ্জনধর, মাদার বখ্শ প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। পরদিন ২৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশ অতর্কিতভাবে প্রবেশ করে শহিদ মিনার ভেঙে ফেলে। সেই স্মৃতি প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান বলেন,

> ২৪ তারিখের বড়ো ঘটনা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ-হস্টেলের প্রাঙ্গণে পুলিশের অতর্কিত প্রবেশ ও শহীদ মিনার ভেঙে ফেলা। ঘটনাটি ঘটে আমাদেরই চোখের সামনে। পুলিশ আসার খবর পেয়ে আমরা কয়েকজন হাসপাতালের প্রাঙ্গণে লোহার রেলিং ধারে অকুস্থলের যতোটা সম্ভব কাছে সমবেত হই। শেরওয়ানি-পাজামা-পরা দীর্ঘদেহী ইমাদুল্লাহ্ রেলিংয়ের শিক ধরে সজলচক্ষে ও রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করছিলেন, 'ক্যামেরা, ক্যামেরা, কেউ একজন ক্যামেরা নিয়ে এসো। ওরা শহীদ মিনার ভেঙে ফেলছে – ছবি তুলে রাখো, ছবি তুলে রাখো।' ওই মুহূর্তে সত্যিই মনে হয়েছিলো, মিনারের ওপর যত আঘাত তা আমাদের গায়ে এসে পড়ছে।[২৬]

২৫ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটের দিনে আনিসুজ্জামান প্রচারপত্র বিলি করেন।[২৭] এছাড়া তিনি উল্লেখ করেন, এদিনই অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা আসে। শাসকগোষ্ঠী আন্দোলন দুর্বল করতে ছাত্রদের হল ছাড়তে বাধ্য করে। পুলিশ এবং সেনাবাহিনী দিয়ে প্রোভোস্টের অনুমতি ছাড়াই হলে খানাতল্লাশি চালায়। একইভাবে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে এবং জগন্নাথ কলেজেও পুলিশ অতর্কিত প্রবেশ করে মাইক ছিনিয়ে নেয়। এভাবে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে আন্দোলনের প্রধান নেতাদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে নেতাকর্মীদের দমনে সফল হয়।[২৮] এর ফলে ফেব্রুয়ারি শেষ নাগাদ আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। মার্চে আর আন্দোলন সেভাবে টিকে থাকেনি। সারাদেশে গ্রেপ্তার করার ফলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ নেতৃত্বহীন হয়ে

পড়ে। এপ্রিলে শেষ নতুন কমিটি গঠন করা হলেও তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। দমননীতির ফলে পাঁচ মার্চ আহূত ধর্মঘট সফল হয়নি। আবার ৭ মার্চ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভার সবাইকে গ্রেফতার করলে আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

আনিসুজ্জামানের ভাষ্যমতে, ভাষা-আন্দোলনে প্রকাশ্যে যুবলীগ নেতৃত্বদান করলেও আড়ালে থেকে কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয় প্রভাব রেখেছিল। তিনি তাঁর লেখায় আন্দোলনে তাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টি গোপনে অন্য সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলনে সহায়তা করতো। যুবলীগের নেতৃবৃন্দের অনেকেই ছিলেন কমিউনিস্ট। ফলে যুবলীগের কোনো সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে সেসব নেতাদের মাধ্যমে কমিউনিস্টরা প্রভাব ফেলতেন।[২৯] ২০ ফেব্রুয়ারির সভায় পরদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ব্যাপারে পার্টি থেকে কী সিদ্ধান্ত আসে তার জন্য অপেক্ষা করা হয়েছিলো। 'অলি আহাদ চান ১৪৪ ধারা ভাঙতে, তোয়াহার বক্তব্য অস্পষ্ট, আসলে তিনি অপেক্ষা করছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তের জন্যে'।[৩০] এছাড়া ভাষা-আন্দোলন চলাকালে পার্টিও গোপন নেতাদের তৎপরতা; বিশেষত শহীদুল্লা কায়সার যে ভূমিকা পালন করেন, তা আনিসুজ্জামান তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন।

> ২১ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করাই যে সংগত ছিল, তা মেনে নিয়ে, গোপন কমিউনিস্ট পার্টি এখন আন্দোলন বেগবান করার চেষ্টা করে। তাদের পক্ষ থেকে শহীদুল্লা কায়সার মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। সে-সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, তবে কমিউনিস্ট পার্টির আর যে-দুজনকে অধিকাংশ সময়ে মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলে দেখেছি, তাঁদের মধ্যে একজন হস্টেলেরই বাসিন্দা মনজুর হোসেন ও অপরজন সাদেক খান।[৩১]

ভাষা-আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভূমিকা আনিসুজ্জামান তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন। যুবলীগ অফিসের পরই ঢাকা মেডিকেল কলেজের এই হোস্টেল আন্দোলনের সময় এটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলো। আনিসুজ্জামান লিখেছেন: 'আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, নেতারা যে যখন পারতেন এখানে আসতেন বৈঠকও এখানেই বসতো; এখান থেকেই কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়তো সারাদেশে।'[৩২] শহিদ মিনার নির্মাণেও মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১৯৫৩ সালে মহাসমারোহে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হয়েছিলো। আনিসুজ্জামান বর্ণনা করেছেন, হাজার হাজার মানুষ, নারী-পুরুষ, বালবৃদ্ধ – খালি পায়ে আজিমপুর কবরস্থানে শহিদ বরকত ও শফিউর রহমানের সমাধিতে এবং মেডিকেল কলেজে ছাত্রাবাসের সামনে প্রথম গুলি বর্ষণের জায়গায় নিবেদন করে।[৩৩] প্রভাত ফেরিতে গান গেয়ে নারীরাও কবরস্থানে ফুল দিতে গেলে নারীদের ব্যাপারে কবরস্থানের লোকেরা আপত্তি জানালেও পরে তা টেকেনি। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির সংগঠিত উদ্যোগের চেয়ে মানুষ স্ব-ইচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছিলো। ক্ষোভ এবং শোক প্রকাশের চেয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ছিল তখন মুখ্য। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান লেখেন –

> ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে, আমার মনে হয়, সংগঠিত উদ্‌যোগের চাইতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল বেশি। সংগঠনের ব্যানার ছিল, কিন্তু পাড়া ও মহল্লার পোস্টার ছিল অধিক। ক্ষোভ ও শোক প্রকাশের চেয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ছিল তীব্রতর। মনে হচ্ছিল তখনই এই দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে এবং মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে যথেষ্ট উত্তাপ সঞ্চিত হয়েছে।[৩৪]

এ বছর প্রকাশিত ভাষা-আন্দোলন নিয়ে সাহিত্য-সংকলনের ক্ষেত্রে হাসান হাফিজুর রহমানের 'একুশে ফেব্রুয়ারি', প্রথম ও কালজয়ী।[৩৫] 'একুশে ফেব্রুয়ারি' শীর্ষক এই সংকলনে আনিসুজ্জামান একটি গল্প লেখার পাশাপাশি এর উৎসর্গপত্রও লেখেন সেটি তাঁর হাতের লেখায় ছাপা হয়। এই উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন,

যে অমর দেশবাসীর মধ্যে থেকে
জন্ম নিয়েছে একুশের শহীদেরা
যে অমর দেশবাসীর মধ্যে অটুট
হয়ে রয়েছে একুশের প্রতিজ্ঞা–
তাঁদের উদ্দেশ্যে[৩৬]

১৯৫৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পালন সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। ভাষা-আন্দোলনে শহীদদের জন্য শোক প্রকাশ, ধর্মঘট, মিছিল ও সভা করা যাবে না এই ছিল সরকারি আদেশ। তবে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনে ১৯৫২ সালের মতোই ছাত্ররা আগেই সিদ্ধান্ত নেয় আদেশ অমান্য করার। পুলিশও আগে থেকেই ঢাকাসহ সারাদেশ থেকে ছাত্রনেতা, যুবনেতা ও শ্রমিকনেতাদের গ্রেপ্তার করে। তবে একুশের দিন প্রতিবাদ থামানো যায়নি। পুলিশের ছাত্রদের লাঠিচার্জ এবং অসংখ্য ছাত্রদের গ্রেফতার সত্ত্বেও আনিসুজ্জামান এদিন মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। 'একুশের সকালবেলায় কলা ভবনের মাথায় এবং হলগুলোতে কালো পতাকা উড়ালো। আমরা ক্লাস না করে প্রাঙ্গণে জড়ো হলাম, স্লোগান দেওয়া হলো 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।[৩৭]

৩. ভাষা-আন্দোলনের প্রভাব পর্যবেক্ষণ

আনিসুজ্জামানের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, ভাষা-আন্দোলনের প্রভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ এবং মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিস্তার ঘটেছে। এছাড়া এ আন্দোলনের কারণেই সম্ভব হয়েছে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক পট-পরিবর্তন এবং স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন। একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ হওয়া ছাত্রদের আত্মত্যাগ বাঙালি জাতির আত্মবিশ্বাস ও আত্মপরিচয়ের সংকেত হিসেবে কাজ করেছে। একইসাথে ভাষা-আন্দোলনের সফলতা জনগণের মধ্যে একতাবদ্ধ শক্তির ধারণা তৈরি করেছে, যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনগুলোকে শক্তি জোগায়। এই একতা বাঙালির মধ্যে একটি দৃঢ় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে, যা স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩.১ মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা

ভাষা-আন্দোলনে মূলত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপান্তরিত করাই ছিল মূল দাবি। ভাষা-আন্দোলনের কারণেই ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে শর্তসাপেক্ষে উর্দুর সাথে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিলো। আনিসুজ্জামান তাঁর "পঞ্চাশ বছরের অবিরাম স্বপ্ন" প্রবন্ধে পাকিস্তান আমলে সে স্বীকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে সেটি যে প্রকৃত স্বীকৃতি ছিল না, সে কথা বলতেও তিনি ভোলেননি। আনিসুজ্জামান বলছেন, 'পাকিস্তানের দুটি সংবিধান ১৯৫৬ ও ১৯৬২ তে আমাদের সে দাবি পূরণ হয়েছিলো তবে দুবারই শর্ত ছিল কুড়ি বছর পর তার প্রয়োগ হবে'।[৩৮] তবে বাংলাদেশের মানুষকে এতদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে বাংলার সাংবিধানিক স্বীকৃতি মেলে। ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানে সহজ, সরল, স্পষ্ট উক্তি করা হয়: 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'।[৩৯] এটিকে আনিসুজ্জামান একুশে ফেব্রুয়ারির বিজয় হিসেবে দেখেছেন।

পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলা বর্ণমালা পরিবর্তন করে আরবি ও রোমান হরফে লেখার প্রচেষ্টাসহ বাংলা বানান সংস্কারের চেষ্টার নামে মাতৃভাষার উপর যতবার আঘাত করার চেষ্টা করেছে ততবার এদেশের সচেতন বাঙালি জনগণ একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তা প্রতিরোধ করেছে। ১৯৬২ সালের হরফ-সংস্কার কমিটি, বাংলা কলেজের বাংলা বর্ণমালা সংস্কার সাধন প্রচেষ্টা প্রভৃতির বিপরীতে ছাত্র, শিক্ষক ও লেখকরা প্রতিবাদ করেন। মাতৃভাষার বিরুদ্ধে এসব ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে আনিসুজ্জামান উল্লেখ করেন ১৯৭১ এর ২১ ফেব্রুয়ারিতে ক্রিসমাস ট্রির মতো বাংলা হরফের ছোটগাছ বর্ণতরুর মাধ্যমে অভিনব প্রতিবাদ প্রসঙ্গে।[৪০]

এছাড়া ভাষা-আন্দোলন বাঙালি জাতির মধ্যে গভীরভাবে ভাষার প্রতি সচেতনতা ও ভালোবাসার অনুভূতি সৃষ্টি করেছিলো। এই আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা বাঙালি জনগণের মধ্যে ভাষার প্রতি একটি সংগ্রামী মনোভাব গড়ে তোলে।[৪১] ফলে একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মত্যাগের মাধ্যমে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানের ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি পায়।

৩.২ সাংস্কৃতিক পট-পরিবর্তন

আনিসুজ্জামান মনে করেন, ভাষা-আন্দোলনের ফলেই মুসলিম বাঙালিদের মধ্যে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত আত্মপরিচয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিলো।[৪২] ফলে একুশে ফেব্রুয়ারির পর সারাদেশে এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক চেতনার সঞ্চার হয়েছিলো। গতি পেয়েছিল সংস্কৃতি সাধনায়। ভাষা-আন্দোলনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রভৃতির পারস্পরিক সাফল্যের তুলনা করলে যে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে সে কথা আনিসুজ্জামান উল্লেখ করেন। এছাড়া সাংস্কৃতিক উদ্যমসমূহের সঙ্গে জনসাধারণের গভীর সম্পর্কের কথা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনসাধারণের উদ্যোগ ও আগ্রহের কথা। আনিসুজ্জামান ভাষা-আন্দোলনের অব্যবহিত পর লেখা একটি প্রবন্ধে মনে করেছেন, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের এই চেতনাবোধ ও সমর্থন সংস্কৃতিবিদদের সৃষ্টিতে প্রেরণা দিয়েছিল এবং সংস্কৃতি সাধনায় সকলে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো। বাংলা সংস্কৃতির এই ইতিবাচক পরিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন,

> একুশে ফেব্রুয়ারির পর তাই বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সমাবেশ ঘটেছে, উদ্ভব হয়েছে ছোট-বড় নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের এবং আবির্ভাব ঘটেছে নানা পত্রপত্রিকার। বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ এবং এর পঠন-পাঠন ও চর্চা ক্রমশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।[৪৩]

পাকিস্তান আমলে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে হিন্দু-ঐতিহ্য ঘেঁষা ট্যাগ দিয়ে বিভিন্নভাবে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। আনিসুজ্জামানের ভাষ্যমতে, একজন কবি প্রস্তাব করেন নজরুল-কাব্যের অবাঞ্ছিত অংশ মানে হিন্দু ঐতিহ্যমণ্ডিত অংশ বাদ দিয়ে নজরুল রচনাবলি পূর্ব বাংলায় প্রকাশ করা হোক।[৪৪] তিনি আরো উল্লেখ করেন, এ সময়ে বেতার থেকে কীর্তন-শ্যামাসঙ্গীতের প্রচার বন্ধ হয়েছিলো। উনিশ শতকের নাট্যকার ও সংগীত রচয়িতাদের সৃষ্টির প্রচারে, সরকার প্রচারিত সাহিত্য পত্রে মুসলমান লেখক বিচার করে প্রচার করা হতো। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পাঠ্যসূচিতেও পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয়। তবে শিক্ষিত সাধারণ মানুষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে পুরনো বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা ভাষা-আন্দোলনের ফলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল।

সরকারি সমর্থনে বাংলা সংস্কৃতি চর্চায় নানা বিরোধিতার বিপরীতে পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা সংস্কৃতি সাধনায় যে আরো গতি পায় তা আনিসুজ্জামান তাঁর "রাষ্ট্রভাষা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক" প্রবন্ধে আরো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। বাংলা সংস্কৃতিকে দমিয়ে রাখার বিপরীতে সাংস্কৃতিক জাগরণের কারণে ঐতিহ্য প্রীতি ও কিছুটা প্রতিবাদ থেকেই ঋতু-উৎসব ও বাংলা নববর্ষ-উদযাপন, পুরোনো বাংলা গানের আসর, কীর্তন শ্যামা সংগীত থেকে শুরু করে মুকুন্দ দাসের গান, এমনকি চর্যাপদের সুর বসিয়েও গান গাওয়া হয়েছে। এছাড়া এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর আরো জনপ্রিয়তা পায়। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্যোগে 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০' উদ্‌যাপিত হয়। সাত দিনের এই উদ্যোগটি বেশ সাড়া ফেলে। এছাড়া বাংলা সংস্কৃতি চর্চায় রবীন্দ্র জয়ন্তীতে বাধা, রবীন্দ্র সংগীত ও নাটকের প্রচার বন্ধ, ভারতীয় পুস্তক পুনর্মুদ্রণ নিষিদ্ধের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার মানুষের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যাহত করার চেষ্টা করা হয়। তবে সকল অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ভাষা-আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পূর্ব-বাংলা সাংস্কৃতিক চেতনার বহমান ধারা তারা থামিয়ে রাখতে পারেনি।

৩.৩ বাঙালি জাতীয়তার বিকাশ

ভাষা-আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কারণ এটি বাঙালির ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দমননীতি ও বাংলাকে উপেক্ষার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন বাঙালিদের মধ্যে ঐক্য ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বোধ জাগ্রত করে। এর ফলে পরবর্তী সময়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান লেখেন,

> পাকিস্তানি শাসকদের আঘাতে আঘাতে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত আত্মপরিচয় সম্পর্কে আমরা ক্রমে সচেতন হয়েছি এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ ততোই আমাদের মধ্যে ঘটেছে। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়েই শুধু এ-ভাবধারার পুষ্ট হয়নি। বাংলা নববর্ষ-উদ্‌যাপন, ঋতু-উৎসব-পালন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীতচর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যতো বেশি সরকারি বাধা এসেছে, রোমান হরফে বাংলা লেখার কিংবা বাংলা বর্ণমালা-সংস্কারের উদ্যোগ নিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে আমাদের যত দূরে সরাবার চেষ্টা হয়েছে, ততোই আমরা নিজেদের বাঙালিত্বকে সজোরে আঁকড়ে ধরেছি।[৪৫]

আনিসুজ্জামানের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভাষা-আন্দোলন শুধু ভাষার অধিকারের জন্য সংগ্রাম ছিল না, এটি ছিল বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশের ভিত্তি। একুশে ফেব্রুয়ারির উদযাপন, বাংলা নববর্ষ, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীতচর্চা, ঋতু উৎসবসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হলেও, এসব বাধাই বাঙালিকে তার নিজস্ব পরিচয় আরও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে। ফলে ভাষা-আন্দোলন কেবল ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণ ও বিকাশের অন্যতম নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছিল।

৩.৪ অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিস্তার

আনিসুজ্জামান তার "বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন ও ধর্মনিরপেক্ষতা" প্রবন্ধে ভাষা-আন্দোলনের সাথে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের যে উন্মেষ ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করেছেন। এ আন্দোলনে উর্দুর আধিপত্য প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষ ধর্মের নামে শোষণ ও উৎপীড়ন এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আনিসুজ্জামান লেখেন, 'ভাষা-আন্দোলনের পরে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ কিংবা প্রতিষ্ঠিত ছাত্র ও রাজনৈতিক দলের অসাম্প্রদায়ীকরণ সম্ভবপর হয়েছিল শুধু নয়, অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।'[৪৬] এ সময়ে যুবলীগ ও কমিউনিস্টদের জ্যেষ্ঠ নেতারা স্থির করেন অসম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার। এভাবেই ছাত্র ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ ঘটে মূলত ভাষা-আন্দোলনের কারণেই। যদিও অসাম্প্রদায়িক একটি ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও এবিষয়ক আলোচনা ভাষা-আন্দোলনের পূর্ব থেকেই হয়েছিলো তবুও ভাষা-আন্দোলনের কারণে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়। একইভাবে ছাত্র সংগঠনের পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের পরে ঠিক তেমনি করে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠনের কথা উঠে। এর ফলে মূলত ভাষা-আন্দোলনের প্রভাবেই গঠিত হয় গণতন্ত্রী দল।

অসাম্প্রদায়িকতার বহিঃপ্রকাশ রাজনৈতিক অন্য দলগুলোর ক্ষেত্রেও ঘটতে থাকে, আওয়ামী মুসলিম লীগের 'মুসলিম' বাদ দিয়ে দলের নামকরণ করতে হয়। এমনকি আওয়ামী লীগের নেতারা ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার কালে রাষ্ট্রের ইসলামী প্রজাতন্ত্র নামকরণের আপত্তি জানান। এছাড়া আনিসুজ্জামান মনে করেন যে, ভাষা-আন্দোলনের ফলে জাগ্রত অসাম্প্রদায়িকতার কারণেই ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে সকলে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিল। এমনকি এই সচেতনতা থেকেই পাকিস্তান আমলে আর কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়নি।[৪৭]

৩.৫ স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন

ভাষা-আন্দোলনের সফলতা বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ফলে ভাষা-আন্দোলনের প্রভাবে পূর্ব-বাংলার রাজনীতিতে পরিবর্তন আসে। দেশভাগের পর মুসলিম লীগের যে নিরঙ্কুশ জনসমর্থন

ছিল সে পরিস্থিতি বদলে যায় চারিদিকে মুসলিম লীগ বিরোধী ভাবাবেগ প্রবল হয়। এ সময়ে সরকার সমর্থকরা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগ আর তাদের আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারেনি। আনিসুজ্জামান তাঁর রচনায় বলেছেন,

> আন্দোলন পরবর্তী বন্ধের পরে কলেজ যখন আবার খুললো তখন আন্দোলনের রেশ না থাকলেও মুসলিম লীগ বিরোধী ভাবাবেগ খুব প্রবল ছিল। সরকার সমর্থকরা সেই চুপসে গেলো, সে-অবস্থার আর পরিবর্তন হয়নি।[৪৮]

মুসলিম লীগের একচ্ছত্র আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের বিরোধী শক্তিগুলো আরও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে। যা বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাঙালি সংস্কৃতির অংশ হিসেবে মেনে নিতে চায়নি এবং তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে বাধা দেয়। কিন্তু বাঙালিরা ভাষা-আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারকে উপেক্ষা করে ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করে, যা সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতীক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে সরকারি বাধাকে এদেশের একদল সাংস্কৃতিক সচেতন মানুষ যেভাবে মোকাবেলা করেছিলেন তাকে আনিসুজ্জামান ভাষা-আন্দোলনের সাথে তুলনা করেছেন। ভাষা-আন্দোলন থেকে বাঙালিরা লড়াই করার মনোবল পেয়েছিল এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান বলেন,

> বাধা দিলে বাধবে লড়াই এই মনোভাব কাজ করেছিলো সেদিন। তখন মনে হয়েছিলো, এখনো মনে হয় সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমরা সেদিন জয়ী হয়েছিলাম ভাষা-আন্দোলনের মতো আরেকটি আন্দোলনে।[৪৯]

বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন বাঙালির মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও প্রতিবাদী চেতনা গড়ে তোলে। ভাষা-আন্দোলন দেখিয়ে দেয় যে সংগঠিত প্রতিরোধের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে জয় সম্ভব। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনেও ভাষা-আন্দোলনের চেতনা কাজ করেছিল। **১৯৫২** সালের ভাষা-আন্দোলন শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় দমননীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয়। পরবর্তীকালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন এবং **১৯৬৯** সালের গণঅভ্যুত্থান সেই একই চেতনায় পরিচালিত হয়।[৫০] এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামানের মতো ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকও একই কথা বলেছেন,

> এ কথা সত্য যে পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকজুড়ে একুশের চেতনা 'শহীদ দিবস' পালনের মধ্য দিয়ে আধিপত্যবাদী পাকিস্তানি শাসক শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের প্রেরণা জুগিয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছে। স্বৈরশাসন বা সামরিক শাসনও তা রুখতে পারেনি। তাই একুশের ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই ছিল না, ছিল গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের নেপথ্য শক্তি। এ শক্তির ধারাবাহিকতায় সম্ভব হয়েছিল ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন, এমনকি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধ। আর ওই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন ভাষিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ।[৫১]

সর্বোপরি, ভাষা-আন্দোলন সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যেমন লড়াইয়ের সাহস যুগিয়েছে তেমনি মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও জুগিয়েছে লড়াইয়ের সেই সাহস। কারণ বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও লড়াই করার মানসিকতা এই দুইয়েরই উৎস ছিল ভাষা-আন্দোলন। আনিসুজ্জামান ভাষা-আন্দোলনকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন–'এই নতুন জাতিসত্তার সূচনা **১৯৫২**-তে, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ভাষাপ্রীতি, আত্মত্যাগ, জাতিগত ঐক্যবোধের মধ্য দিয়ে। **১৯৫২**-তে যার সূচনা, **১৯৭১**-এ তার প্রতিষ্ঠা'।[৫২] বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক ভিত্তি তৈরি করে, কারণ এটি বাঙালির মধ্যে স্বাধিকারের চেতনা জাগিয়ে তোলে। ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ধীরে-ধীরে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবিতে রূপ নেয়, যা ছয় দফা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান এবং শেষ পর্যন্ত **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়। ভাষা-আন্দোলন বাঙালিকে লড়াই করার সাহস ও ঐক্যের শিক্ষা দেয়, যা মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪. উপসংহার

ভাষা-আন্দোলনে আনিসুজ্জামানের ভূমিকা ছিল বহুমাত্রিক ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনে প্রথম প্রচারপত্র রচনার মাধ্যমে তিনি আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি গঠনে সাহায্য করেছেন। পাশাপাশি **২১** ফেব্রুয়ারির ঘটনাপ্রবাহে তার সক্রিয় উপস্থিতি এবং আহতদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তার সাহসিকতা ও মানবিক দিক উন্মোচিত হয়। এছাড়া ভাষা-আন্দোলন শুধু মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছিল না; এটি ছিল বাঙালি জাতিসত্তার আত্মদর্শন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথচলার সূচনা। আনিসুজ্জামানের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, এই আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বিকশিত হয়। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ জাতির আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্বাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক পট-পরিবর্তনসহ স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে বাঙালিকে অগ্রসর করে।

তথ্যনির্দেশ

[১] মাজহারুল ইসলাম ও আবদুল্লাহ নাসের সম্পা., *দীপ্রমনীষা* (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১৫), পৃ. ৬৮।

[২] আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি* (ঢাকা: সাহিত্যপ্রকাশ, ২০০৩), পৃ. ১২২।

[৩] আনিসুজ্জামান, "গৌরবের সেই মুহূর্তগুলো", *মহামানবের সাগরতীরে* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০২১), পৃ.১৫৫।

[৪] বিশ্বজিৎ ঘোষ, "আনিসুজ্জামান কালের কথক", *উত্তরাধিকার*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন, ২০২০), পৃ. ৮১।

[৫] *দীপ্রমণীষা*, পৃ. ৬৮।

[৬] বদরুদ্দীন উমর, "ভাষা আন্দোলন", *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, সিরাজুল ইসলাম সম্পা., (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ৩৫৬-৫৭।

[৭] রফিকুল ইসলাম, *ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার* (ঢাকা: আনন্দ, ১৯৮২), পৃ. ১৭।

[৮] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা: সুবর্ণ, ১৯৮৪), পৃ. ১৯১।

[৯] কাল নিরবধি, পৃ. ১৭০।

[১০] "গৌরবের সেই মুহূর্তগুলো", *মহামানবের সাগরতীরে*, পৃ. ১৫৬।

[১১] আনিসুজ্জামান, "আবুল হাশিম," *স্মরণ ও বরণ* (ঢাকা: চন্দ্রাবতী একাডেমি, ২০১৮), পৃ. ২৭।

[১২] *কাল নিরবধি*, পৃ. ১৭৩।

[১৩] আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন*(ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০০৯), পৃ. ৪২।

[১৪] আনিসুজ্জামান, "জীবনে আমার কোন খেদ নেই", প্রথম আলো, ২৯ অক্টোবর, ২০১৭।

[১৫] "গৌরবের সেই মুহূর্তগুলো", *মহামানবের সাগরতীরে*, পৃ. ১৫৮।

[১৬] *কাল নিরবধি*, পৃ. ১৭৫।

[১৭] তদেব, পৃ. ১৭৪।

[১৮] *পূর্ববাংলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২২।

[১৯] "ভাষা আন্দোলন", *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, পৃ. ৩৫৬-৫৭।

[২০] *কাল নিরবধি*, পৃ. ১৭৫-৭৬।

[২১] "ভাষা আন্দোলন," *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, পৃ. ৩৬৩।

[২২] *কাল নিরবধি*, পৃ. ১৭৮।

[২৩] *পূর্ববাংলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১।

[২৪] রফিকুল ইসলাম, *ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার*, পৃ. ৭০।

[২৫] আবুল হাসনাত, "স্বরূপসন্ধানী আনিসুজ্জামান", আবুল হাসনাত সম্পা., *আনিসুজ্জামান স্মরণ*, (বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা. ২০২১), পৃ. ৩৮৮।

[২৬] *কাল নিরবধি*, পৃ. ১৮১।

[২৭] তদেব।

[২৮] তদেব, পৃ. ১৮১-৮২।

[২৯] নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চল্লিশ বছর* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ১৯।

[৩০] *কাল নিরবধি*, পৃ. ১৭৩।

[৩১] তদেব, পৃ. ১৭৯।

[৩২] তদেব, পৃ. ১৭৮।

[৩৩] তদেব, পৃ. ২০৯।

[৩৪] তদেব, পৃ. ২১০।

[৩৫] আনিসুজ্জামান, "হাসান হাফিজুর রহমান," *চেনা মানুষের মুখ* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ১৬৪।

[৩৬] আনিসুজ্জামান, "একুশের চেতনা", *জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের শিক্ষাচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবনা*, এ. এন. রাশেদা, সম্পা., পৃ. ৮৩।

[৩৭] *কাল নিরবধি*, পৃ. ২৫৬।

[৩৮] আনিসুজ্জামান, "পঞ্চাশ বছরের অবিরাম স্বপ্ন", *গৌরবের সেই মুহূর্তগুলো*, পৃ. ১১।

[৩৯] আনিসুজ্জামান, "রাষ্ট্রভাষা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক", *আত্মপরিচয়, ভাষা-আন্দোলন, স্বাধীনতা* (ঢাকা: চন্দ্রাবতী একাডেমি, ২০১৫), পৃ. ১৪৮।

[৪০] আনিসুজ্জামান, "বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন ও ধর্মনিরপেক্ষতা", *আত্মপরিচয়, ভাষা-আন্দোলন, স্বাধীনতা*, পৃ. ১৩৮।

[৪১] "একুশে ফেব্রুয়ারি ও আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা", প্রথম আলো, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২।

[৪২] আনিসুজ্জামান, "আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও সংবিধানের মূলনীতি", *বাঙালি ও বাংলাদেশ* (ঢাকা: মিত্র ও ঘোষ পালিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০১৪), পৃ. ১১০।

[৪৩] "একুশে ফেব্রুয়ারি ও আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা", প্রথম আলো, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২।

[৪৪] আনিসুজ্জামান, "রাষ্ট্রভাষা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক", *আত্মপরিচয়, ভাষা-আন্দোলন, স্বাধীনতা*, পৃ. ১৪০-১৪১।

[৪৫] *বাঙালি ও বাংলাদেশ*, পৃ. ১১০।

[৪৬] আনিসুজ্জামান, "বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন ও ধর্মনিরপেক্ষতা", *আত্মপরিচয়, ভাষা-আন্দোলন, স্বাধীনতা*, পৃ. ১৫৮।

[৪৭] *বাঙালি ও বাংলাদেশ*, পৃ. ১১০।

[৪৮] *কাল নিরবধি*, পৃ. ১৮৫।

[৪৯] তদেব, পৃ. ৩৪১।

[৫০] "একুশের চেতনা", *আত্মপরিচয়, ভাষা-আন্দোলন, স্বাধীনতা*, পৃ. ১৫৫।

[৫১] আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন*, পৃ. ৮৫-৮৬।

[৫২] "বাংলাদেশ, বাঙালি ও বাংলাদেশি," *বাঙালি ও বাংলাদেশ*, পৃ. ১১৮।